কয়েক দিন পূর্বে কোনো এক চ্যানেলে একটি খবর দেখছিলাম। এক প্রাইমারি স্কুলের সামনের মাঠে যেখানে শিশুরা খেলাধুলা করতো, সকলে সমবেত হয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলনসহ জাতীয় সংগীত গাইতোÑ মাঠটি একটু নিচু হওয়ায় সেই মাঠের পানি নিষ্কাশনের পথ বন্ধ করে মাছ চাষ করা হচ্ছে। স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির চেয়ারম্যান ও প্রধান শিক্ষকের বুদ্ধিতে এই কর্মটি হয়েছে। কেউ বলতে পারেন- এদের কী উপাধি দিলে যথার্থ হয়? এতদিন ধরে অনেক খবর জেনেছি। যেমন স্কুলের জমি দখল করে বিল্ডিং বানিয়ে হাজার হাজার বা লাখ লাখ টাকা সেলামি নিয়ে ভাড়া দেয়া হয়েছে, কিন্তু স্কুলকে কানাকড়িও দেয়া হয়নি, অথচ এর জন্য স্কুল ফান্ডের টাকাও তারা নিয়েছে। গাছপালা কেটে নেয়া হয়েছে, মাঠে হাট-বাজার বসানো হয়েছে, ভিন্ন চিন্তার শিক্ষকদের চাকরিচ্যুত করা হয়েছে ইত্যাদি। যে দল যখন রাষ্ট্র ক্ষমতায় এসেছে তাদের অনুসারী শিক্ষকদের, শিক্ষক সংগঠনের নেতৃত্বেও নিয়ে এসেছে। যেমন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান পুলিশ বাহিনী দিয়ে 'বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি'র অফিস দখল করে সমিতির সভাপতি মুক্তিযুদ্ধকালীন সরকারের এমএনএ, জুবিলী স্কুলের প্রধান শিক্ষক মো. কামরুজ্জামান, সমিতির সাধারণ সম্পাদক নারায়ণগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সদস্য শ্রীমতি হেনা দাসসহ অনেককে অফিস থেকে গ্রেফতার করে তাদের বিরোধী পক্ষ জয়নুল আবেদীন গ্রুপকে অফিসে বসিয়ে দিয়েছিলেন। এ ধরনের নানাজনের হাজারও বেআইনি ও নিন্দনীয় ঘটনার ধারাবাহিকতাতেই আজ স্কুলের খেলার মাঠ দখল করে মাছ চাষ করা হচ্ছে। অথচ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাঠের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য এবং খেলাধুলা, শরীরচর্চা শিক্ষাজীবনেরই অংশ। সৎ নিষ্ঠাবান, আদর্শবাদী শিক্ষকদের স্কুল থেকে বিতাড়ন এবং ফলস্বরূপ সেইসব শিক্ষকগণের অনুপস্থিতির কারণে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে 'শিক্ষা'-র মূল দর্শনই ধীরে ধীরে নির্বাসিত হয়েছে।

'৮০-এর দশকে '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে রাজাকার শিরোমণি কথিত মৌলানা মান্নানকে শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের মহাসচিব এবং ক্যু-এর মাধ্যমে ঘোষিত রাষ্ট্রপতি লে. জে. হুসেইন মুহম্মদ এরশাদকে ওই ফেডারেশনের চেয়ারম্যান করা হলো। শিক্ষক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা, শিক্ষকদের অধিকারসহ দায়িত্ব-কর্তব্য, ন্যায়পরায়ণতা, বিবেকবোধ গড়ে তোলার যে-প্রচেষ্টা দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষকরা নিজেরাই করে আসছিলেন সংগঠনের মাধ্যমে তা সামরিক শাসকদের পরম্পরায় ক্ষমতার পালাবদলে প্রায় বিলীন হয়ে গেছে। তবে এখানে স্মরণ করতে হবে ১৯৮৩ সালের ১৪ ও ১৫ ফেব্রুয়ারিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মজিদ খানের শিক্ষা সংকোচন নীতির বিরুদ্ধে গর্জে ওঠার কথা। সেদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিশু একাডেমি পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল রাজপথ। মোজাম্মেল, কাঞ্চন, দীপালী সাহাসহ অনেকে শহীদ হয়েছিলেনÑ যাদের সবার লাশ পাওয়া যায়নি। এই যে সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোÑ

ছাত্রসমাজের এই সাহসী অংশটুকু সমাজের মাঝে পরশ পাথর হয়ে আছে। সেই ছোঁয়ায় কিছু অংশ মানুষের মধ্যে বিবেকবোধ বলে এখনও কিছু আছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও সেদিন এর প্রতিবাদে পথে নেমেছিলেন। আর এই কালের মধ্য দিয়ে যে-সব শিক্ষার্থী শিক্ষাজীবন শেষে আজ স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা পেশায় এসেছেনÑ তাদের বেশিরভাগের মধ্যেই এইসব বিবেকহীনতা ও সুবিধাবাদিতার জন্ম হয়েছে।

’৯০-এর দশকে ছাত্রসমাজ ও সম্মিলিত রাজনৈতিক দলের উদ্যোগে স্বৈরাচারের পতন ঘটার পর জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে যারা ১৯৯১ সালে রাষ্ট্র ক্ষমতায় এলেন তারা তো প্রথম একনেক সভায় ১০ কোটি টাকায় স্থাপিত ‘শিক্ষা উপকরণ বোর্ড’টি বাতিল করে দিয়ে শিক্ষা কার্যক্রমের উপরেই চরম কুঠারাঘাত হানলেন। এর মাধ্যমে বিজ্ঞান ল্যাবের সকল যন্ত্রপাতিসহ বিভিন্ন চার্ট, ম্যাপ সারা দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করা যেত, যা শিক্ষার্থীদের জ্ঞান অর্জনে সাহায্য করতে পারতো। টেস্ট টিউব, বিকার বিদেশ থেকে আমদানি করার প্রয়োজন পড়তো না। সেটাই এর কাল হলো। দেশকে এগিয়ে নেয়ার জন্য শিক্ষা এবং বিজ্ঞান-শিক্ষাই যে প্রথম সোপান এবং শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে পারিপার্শ্বিক সব কিছুরই যে উন্নয়ন ঘটে, এই বোধটুকু তৎকালীন সরকারের ছিল না। এখনও আছে বলে প্রতীয়মান হয় না। কারণ স্কুলে পড়ার পরিবেশ সৃষ্টি না করে, শিক্ষক না দিয়ে এবং দিলেও তার বেতন না দিয়ে শিক্ষা নিশ্চিত করা যায় না। শুধু মাল্টি মিডিয়া দিলে কাজ হয় না। তা চালাতে শিক্ষক প্রয়োজন হয়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প, প্রকৃতি পরিবেশ- এরা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

শিক্ষার উন্নয়ন ঘটলে কি কি হতে পারে-এক নজরে এর সামান্য একটু দেখা যেতে পারে। শিক্ষায় বিনিয়োগ বাড়ালে শিক্ষকদের বেতন ভাতা সম্মানজনকভাবে বাড়লে এবং স্কুল, কলেজে যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ যথার্থভাবে করলে-সব স্কুলেই শিক্ষার মান বাড়তো। এলাকার শিশু-কিশোররা এলাকাভিত্তিক স্কুলেই পড়াশুনা করলে এবং হেঁটে স্কুলে এলে-যেমন তাদের স্বাস্থ্য ভাল থাকবে, তেমনি রাস্তায় গাড়ির জ্যাম একেবারেই কমে যাবে। হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে ওভারব্রিজের প্রয়োজন পড়তো না, অতিরিক্ত গাড়িও আমদানি করতে হতো না, অতিরিক্ত তেল বা গ্যাসেরও প্রয়োজন পড়তো না; প্রকৃতি পরিবেশের জন্য যা হতো শুভ। যা কিছু হবে, তা হতে হবে সর্বজনীন উন্নয়নের লক্ষ্যে। সারা দেশের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবস্থার উন্নতির সঙ্গে এলাকার উন্নতি ঘটতো, মানুষের চিন্তা চেতনার উন্নয়ন হতো, সমাজের প্রতি মানুষের দায়বোধ বাড়তো, কৃষির উন্নয়ন হতো, কৃষক তার অধিকার রক্ষায় শক্তি অর্জন করতো, শ্রমিকও অধিকার সচেতন হতো। স্বাস্থ্য সেবার উন্নতি ঘটলে মানুষ স্বাস্থ্য সচেতন হতো, সুস্থ থাকতো।

অথচ স্বাধীনতার ৪৭ বছর পর্যন্ত শিক্ষাখাত ও স্বাস্থ্য খাত অবহেলিতই রয়ে গেলো, শিক্ষকদের আজও বেতনের দাবিতে রাস্তায় দাঁড়াতে হয়, আজও প্রয়োজনীয় শিক্ষকের অভাবে, ক্লাস-রুমের অভাবে স্কুল-কলেজ সর্বত্র

শিক্ষা-কার্যক্রম ব্যাহত হয়। কেউ কেউ বলবেন, বর্তমান সরকার তো অনেককে শিক্ষাবৃত্তি দিচ্ছেন, অনেক কিছু দিচ্ছেন। হ্যাঁ দিচ্ছেন, কিন্তু সময়মতো চাহিদামতো শিক্ষক নিয়োগ দিতে পারছেন কি? বর্তমান লাল ফিতার বেড়াজালে তা জটিল থেকে জটিলতর করে তুলছেন। শিক্ষাব্যবস্থায় সমস্যার শেষ নেই। স্বাধীনতার পর থেকেই একমাত্র প্রাথমিক শিক্ষা জাতীয়করণ ছাড়া শিক্ষাব্যবস্থার প্রকৃত উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ শুরুই হয়নি- যদিও ১৯৭৪ সালেই শিক্ষানীতি প্রণীত হয়েছিলÑকিন্তু সেই শিক্ষানীতিকে বিসর্জন দেয়া হয়েছে। শিক্ষাকে প্রাইভেট করার জন্য সব সরকারণ এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকেÑযা মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী। ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ‘সংবাদ’-এ প্রকাশিত খবরে জাতীয়করণকৃত কিছু স্কুলের উন্নয়নের নমুনা দেখা যাকÑ ‘পটুয়াখালীতে ১ হাজার ১৫৬টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২২২ বিদ্যালয়েই প্রধান শিক্ষক আর ৪৬৩ জন সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য।’ তার উপরে স্কুলের মাঠও দখল হয়ে যায়। এসবেরই পরিণতিতে বর্তমানে ভয়াবহ কিশোর গ্যাং কালচারÑ তা কারো বুঝতে না পারার কি কিছু আছে? ২৬ সেপ্টেম্বর ‘বাংলাদেশ প্রতিদিন’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছেÑ‘মৌলভীবাজারের ৭ উপজেলায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে ১ হাজার ৫২টি। এর মধ্যে প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য ১৯১টি। সহকারী শিক্ষক পদে নেই ৩৮১ জন।’ তাহলে এইসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদানের উপায় কি? সারা দেশেই এই ধরনের অবস্থা বিরাজ করছে। আর দৈনিক ‘প্রথম আলো’-তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে সরকারি কলেজসমূহের শিক্ষক সংকট, শিক্ষার সংকটের প্রতিবেদন। যেমন ৪ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হয়েছে- ‘সরকারি তিতুমীর কলেজে শিক্ষার্থী সংখ্যা ৩৫ হাজার এবং শিক্ষক ২১২। বাংলা বিভাগে প্রথম বর্ষে ভর্তি ৩৩০ জন আর শ্রেণিকক্ষ বরাদ্দ ১টি। অথচ ৩০০ শিক্ষার্থীর বসার জায়গা কোথাও নেই।’

আবার খুলনার সরকারি বিএল কলেজের প্রতিবেদনে তারা লিখছেন : ‘সরেজমিনে দেখা যায় ৩৩ হাজার শিক্ষার্থীর জন্য যে গ্রন্থাগার, সেটি প্রয়োজনের তুলনায় বেশ ছোট। গ্রন্থাগারের পাঠকক্ষে একসঙ্গে ৫০ জন বসে পড়ার সুযোগ পান। সেটিও আবার মাসে অন্তত দুদিন বন্ধ রাখতে হয় অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য। কারণ কলেজের একমাত্র মিলনায়তনটি দীর্ঘদিন ধরে পরিত্যক্ত’- এই তো অবস্থা শতবর্ষী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে : ‘কলেজের বিজ্ঞান ভবন-২-এ উদ্ভিদবিদ্যা ও প্রাণিবিদ্যা বিভাগের ল্যাব। ভবনটি জরাজীর্ণ। ছাদ থেকে পলেস্তারা খসে পড়ছে। জানালাগুলোও বেশির ভাগ ভাঙা। আছে প্রয়োজনীয় উপকরণের সংকট। প্রাণিবিদ্যা বিভাগের প্রদর্শক পদের দুটিই শূন্য’Ñ ইত্যাদি ইত্যাদি। এরকম বর্ণনা সব সরকারি কলেজের প্রায়ই একই রকম। আর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত বেসরকারি কলেজসমূহেরও ঐ একই অবস্থা এবং সেখানেও কোনো ক্লাস হয় না। সেশনজট কমানোর জন্য ৯ মাস পর পর পরীক্ষা হয়। শিক্ষার্থীরা প্রাইভেট পড়ে আর পরীক্ষা দেয়। তবে কোনো

কোনো প্রাতষ্ঠানে বিশাল বিশাল ভবন হয়েছে নিজেদের উদ্যোগে বা সরকারি সহায়তায়। কিন্তু শিক্ষক শূন্যতা তো রয়েছেই এবং শিক্ষক শোষনও। অর্থাৎ নিয়োগ দিবে কিন্তু বেতন দিবে না।

সারা দেশব্যাপী শিক্ষার অবস্থা এমনই করুণ। শিক্ষক ছাড়া শিক্ষার্থীরা শিক্ষিত হবে কিভাবে, বিবেকবোধ জাগ্রত হবে কি ভাবে? যার জন্য আমরা দেখছি প্রাথমিক শিক্ষালয় থেকে শুরু করে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মাদরাসা, মসজিদ, সর্বত্র বিবেকহীনতা। শিক্ষার কোনো ছাপ নেই। সারা দেশব্যাপী খুন, ধর্ষণ, লুটপাট এবং ক্যাসিনোর দাপট আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে রাষ্ট্র ক্ষমতায় যেয়ে ক্ষমতাধররা দেশকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে। আমরা দেখছি সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের অশিক্ষক সুলভ এবং মনুষ্যত্বহীন আচরণ। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় যে ৪২ টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় তার মধ্যে ২৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ মঞ্জুরি কমিশনের কাছে আছে এবং প্রায় ১১ টি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের বিরুদ্ধে নানা অসঙ্গতি, তহবিল তছরূপ ইত্যাদি অনিয়মের অভিযোগ আছেÑরংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, নোয়াখালী বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এবং বঙ্গবন্ধু প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন চলছে। এসব এতদিনের শাসকগোষ্ঠীর কর্মকা-ের ফল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সময়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. শামসুল হকের বাসভবনে ছাত্ররা ক্ষতিসাধন করেছিলÑ তিনি ব্যর্থতার দায় নিয়ে পদত্যাগ করেছিলেন। অথচ এখন শিক্ষার্থীদের ঝাড়– মিছিলে নির্বিকার উপাচার্য। স্বাধীনতার ৪৭ বছর পর আমরা কতটুকু এগিয়েছি না পিছিয়েছি- তা ভেবে দেখার সময় হয়েছে। যদিও অনেক বিলম্ব। সময় হয়েছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প, প্রকৃতি ও পরিবেশকে অগ্রাধিকার দিয়ে দেশকে এগিয়ে নেয়ার পরিকল্পনা করার। নতুন নেতৃত্ব গড়ে তুলবার।